ATMADEEP
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-I, September, 2024, Page No. 01-18
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 0.69655/atmadeep.vol.1.issue.01W.002

বাংলা কবিতায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিভাবনার স্বতন্ত্রতা: বিষয়ে ও আঙ্গিকে

দেবপ্রসাদ গোস্বামী, *সরকার অনুমোদিত কলেজ শিক্ষক, কাটোয়া কলেজ, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
E mail: goswami.lizaju@gmail.com

Received: 20.08.2024; Accepted: 17.09.2024; Available online: 30.09.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ABSTRACT

Achintyakumar Sengupta is a prominent poet of the Kallol era in Bengali literature. During this time, a world was both destroyed and reborn. As we enter the realm of his poetry, we also witness a stir surrounding the magazine 'Kallol,' which played a significant role in the Bengali literary scene. Sengupta's approach to poetry sets him apart from his contemporaries; for him, poetry represents self-confidence. He believed that poetry brought about a miraculous awakening, revealing profound truths akin to the words of the Supreme God. To Sengupta, the Supreme God embodies the most remarkable poem – poetry is a form of revelation, a blossoming.

He compared poetry to the light of a lamp, illuminating a poet's life. Additionally, there are some unpublished poems in his bibliography. The Kallol poetry group aimed to bring a sense of uniformity to Bengali literature. At that time, Bengali poetry was heavily influenced by Rabindradarshan and Jeevanbhavana, which made it challenging to break free from their dominance. The Kallol group initially maintained an oppositional relationship with Rabindranath Tagore, which later evolved into a respectful acknowledgment. Achintyakumar Sengupta was a pioneer on this path, entering Bengali poetry with the promise of discovering a new world.

In his early work, his poetry was characterized by romanticism, rebellion against Rabindranath, and sentimentality. However, towards the end of his career, themes of God-consciousness and spiritual awareness emerged. This consciousness had been latent in his earlier poetry. We see a gradual development of his belief in God starting from the poem "Ajnma Suravi," which becomes more pronounced in "Uttarayan." He expressed the complex relationship between man and God – both the unity and distance – through his verses.

The poets of the Kallol period employed rebellion and romanticism as mediums to convey their ideas. Yet, while Achintyakumar Sengupta was part of this era, he concluded his poetic journey not with Rati (love), but with Aarti (worship). Along this path, he emerged as a solitary traveler, presenting himself uniquely amidst an epochal crisis.

> 'প্রেমে যার শুরু, বিশ্বব্যাপী সংশ্লেষে তার ব্যাপ্তি। এই সমস্ত বিধৃতির সংকল্প আর শোভাযাত্রাই তাঁর কাব্যপ্রবাহ। সমস্ত বিধৃতি শব্দটি তাঁরই কবিকর্মের লক্ষবাচক।'[১]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতা সম্পর্কে এভাবেই প্রশংসার বাণী উচ্চারিত করেছিলেন হরপ্রসাদ মিত্র। আসলে কবিতার উৎকর্ষ যাচাই করা কঠিন কাজ। প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত রুচি আছে। এক একজন কবি, এক এক রকমের মাপকাঠি ব্যবহার করেন। আমি মনে করি সংগীত, আবেগ, চিত্রকল্প, মনন— এইসব পরম রহস্যের আশ্চর্য অন্বয় যাঁদের কবিতায় পাই, কবিদের মধ্যে তাঁরাই আমার প্রিয়তম। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এরকমই একজন কবি।

অচিন্ত্যকুমার তখন সাউথ সুবার্বণ কলেজের ছাত্র। বন্ধু হিসেবে নির্বাচন করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। কাকতালীয় ভাবে বলা যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্যকুমার যে সময় থেকে 'বন্ধুত্ব' নামক শব্দে জোড়া লেগেছে, সেই সময় থেকেই অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্য লেখার হাতেখড়ি। সেই সময়ে ক্লাসের বাংলার পন্ডিতমশাই এই দুজনের উদ্দেশ্যে যা বলেছিলেন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তা আমাদের জানাচ্ছেন এভাবে—

> 'বাংলার রচনা-ক্লাসে তিনি অনায়াসে চিহ্নিত করলেন আমাদের দুজনকে। যা লিখে আনি তাই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং আরো লেখবার জন্যে প্রবল প্ররোচনা দেন।'[২]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতা রচনার শুরুর সময়টা অন্যান্য কবি সাহিত্যিকদের থেকে আলাদা রকমের। কবিতা তাঁর কাছে আত্মপ্রত্যয়ের। কবিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পরম আত্মীয় দেবযানীকে একটি চিঠিতে বলেছিলেন—

> 'এ কী অলৌকিক জাগরণ—কবিতার জাগরণ, আর পৃথিবীতে কবিতাই তো একমাত্র অলৌকিক। পরমতম যে ঈশ্বর—সেও তো আশ্চর্যতম কবিতা।'[৩]

যাই হোক, এই বিস্ময়ের যাত্রাপথ নিয়ে কবিতা তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল রসের, বশের এবং আবেগের সংমিশ্রণ। শেষ জীবনে স্বয়ং ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ ঠাকুরের সান্নিধ্য তাঁকে আরো পরিণত করেছিল। কবিতা সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি হল—

> 'একটা তৈল স্নিগ্ধ পলতেতে আগুনকে বন্দী করতে পারলেই সে মসৃণ দীপশিখা হয়ে ওঠে, নইলে হয় সে স্ফুলিঙ্গ, নয় সে দাবানল। দীপশিখাটিই কবিতা।'[৪]

অর্থাৎ একটি মৃদু প্রবাহ একই দৃষ্টিতে, একই ভঙ্গিতে, একই উচ্চতায়, একই মসৃণতায় প্রবাহিত হলে তা কবিতার দাবি তৈরি করে। তাই কবিতা সম্পর্কে তাঁর মত এভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

> 'কবিতা হচ্ছে একটা প্রকাশ, প্রস্ফুটন। অন্তরের ভাবকে রসে জ্বাল দিয়ে প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করা। ছন্দ বা মিল, যতি বা ঝংকার—এ সব বসন-ভূষণ মাত্র, প্রাণবস্তু নয়। বৃক্ষের বল্কল-পল্লব মাত্র, নয় পুষ্পবস্তু, প্রাণের আসল দীপ্তিটি চর্মে নয়, চক্ষে। দেখ কতদূর পর্যন্ত সে তাকায়, অন্তরের কোন সুগহন অন্ধকার পর্যন্ত। দেখ একটি চকিত নেত্রপাতে কোন অতলতলের অন্ধকারকে তা আলোকিত করে'।[৫]

কবিতা সম্পর্কে এই বর্ণনা আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে, কবিতা তাঁর কাছে একটা প্রদীপের মত, একটা প্রতীকের মত। সেখানে বসন-ভূষণ-বল্কল ইত্যাদি উপলক্ষ্য মাত্র। পুষ্পরাশি হলো কবিতা যা অন্তরের অতল গহ্বর থেকে উঠে আসে। যাকে অন্তরের গভীর বস্তু দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। অর্থাৎ কবিকে তৈরি হতে

হবে কবিতা রচনার জন্য। কবি মনের চকিত নেত্রপাতে যার জন্ম, সেই কবি সম্পর্কে তিনি আমাদের জানিয়েছেন—

> 'শুধু গম্য বা গ্রাহ্যকে নিয়ে থাকলেই চলবে না, যেতে হবে গোপনের দিকে গভীরের দিকে, গুহায়িত গহ্বরেষ্ঠের দিকে। ইদানীন্তনের সঙ্গে মেশাতে হবে চিরন্তন। যা ইদানীন্তন তা হচ্ছে সংবাদ, যা চিরন্তন তাই সত্য। আর সাহিত্য শুধু সংবাদ নয়, শুধু সত্য নয়— দুয়ে মিলে সাহিত্য হচ্ছে সত্যের সংবাদ। এই সত্যের সংবাদটি যিনি সুন্দরের থালায় পরিবেশন করেন তিনি কবি।'[৬]

অচিন্ত্যকুমার এমনই একজন কবি। তাঁর কবিজীবন প্রায় ৪৫ বছর। অচিন্ত্যকুমারের দীর্ঘ সাহিত্য জীবনে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৮ টি। কিন্তু কাব্যগ্রন্থ আকারে প্রকাশের বাইরেও তাঁর লেখা একাধিক কবিতা রয়েছে। যেগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং প্রচুর অপ্রকাশিত রয়েছে। সেই প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতাগুলোকে তিনি তাঁর 'সমগ্র কবিতা গ্রন্থের' প্রকাশের সময়ে পাঁচটি পর্বে বিন্যস্ত করে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল— ১) 'অমাবস্যা', প্রকাশকাল ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ২) 'আমরা', প্রকাশকাল ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, ৩) 'প্রিয়া ও পৃথিবী', প্রকাশকাল ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ৪) 'নীল আকাশ', প্রকাশকাল ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, ৫) 'আজন্ম সুরভি', প্রকাশকাল ১৩৭২ বঙ্গাব্দ, ৬) 'পূব পশ্চিম', প্রকাশকাল ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, ৭) 'উত্তরায়ণ', প্রকাশকাল ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, ৮) 'শেষ স্বাক্ষর', প্রকাশকাল ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।
এছাড়াও তাঁর কবিতার সেই পাঁচটি পর্ব হলো—

১) 'পূর্ববর্তী কবিতা', ২) 'সমসাময়িক কবিতা', ৩) 'মধ্যবর্তী কবিতা', ৪) 'অন্তর্বর্তী কবিতা'
৫) 'সমীপবর্তী কবিতা'।

> 'তোমার প্রতিভা আমি স্বীকার করি, তোমার শক্তির বিশিষ্টতা আছে। সেই শক্তি যদি কিছু পরিমাণে আত্মবিস্মৃত হত তবে ভালো হতো। রচনার যে বিশিষ্টতা বাহ্যিক, তোমার পক্ষে তার প্রয়োজন ছিল না। যারা অল্পশক্তি তারাই রচনায় নতুনত্ব ঘটাতে চায়—চোখ ভোলাবার জন্যে। কিন্তু যখন তোমার প্রতিভা আছে তুমি চোখ ভোলাবে কেন, মন ভোলাবে।'[৭]

এভাবেই একটি চিঠিতে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সম্পর্কে জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই রবীন্দ্র উচ্চারণ তাঁকে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। বিদ্রোহের সেই দিনে রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে নতুন ভাবনায়, নতুন আঙ্গিকে, নতুন শৈলীতে, নতুন মননে, নতুন কিছু করার বাসনা নিয়েছিলেন এইপর্বের কয়েকজন কবি, সাহিত্যিকরা।

কবিতা কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্যচর্চার অন্যতম প্রধান ফসল। যৌবনের জয়ধজ্বা উড়িয়ে এক সময় বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এসেছিল 'সবুজপত্র' এই চিন্তাভাবনার আধুনিকীকরণ ঘটিয়ে পরবর্তীতে এলো 'কল্লোল'। কবিতায় আনতে চেয়েছিলেন বুদ্ধিমার্জিত, মননপ্রধান মনোভঙ্গি। যেখানে বাস্তবতা অধিক পরিমাণে ফুটে ওঠে কবিতার শরীরে। যাতে বলা যায় শুধু Rime নয়, সঙ্গে চাই Reason. অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে আধুনিক বাংলা কবিতার সূত্রপাত 'কল্লোল' গোষ্ঠীর হাতেই। এ বিষয়ে বিশিষ্ট কবি ও সমালোচক কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য হল-

> 'আজিকার দিনে বাংলা কবিতার যে অংশটিকে আধুনিক বাংলা কবিতা বলা হয়ে থাকে তার শুরু 'কল্লোল' এর যুগে, একটি তরুণ কবিগোষ্ঠী রবীন্দ্র কাব্য ও রবীন্দ্র কাব্যের প্রভাবপুষ্ট কবিতার থেকে স্বতন্ত্র ধরনের কাব্যসৃষ্টিতে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন।'[৮]

বাংলা কাব্যের সমগ্রটা জুড়ে তখন আছেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সময়ের অন্যান্য কবিরা রবীন্দ্রনাথের আলোয় আলোকিত। অর্থাৎ স্বকীয়তা তথা মৌলিকতার বিচারের জায়গায় সহজেই চলে আসবে রবীন্দ্রকাব্যের তথা দর্শনের বন্দনা গান। রবীন্দ্র প্রতিভার সর্বব্যাপী প্রভাব তাঁদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে না পারলে আধুনিক বাংলা কবিতার মুক্তি সম্ভব নয়; তা শুধু রবীন্দ্র কাব্যের চর্বিতচর্বণ হয়ে থাকবে।

এঁদের লক্ষ্য ছিল অভিন্নতা। নতুন ঘরানা তৈরি করা। একদিকে রবি ঠাকুরের কবিতার আকর্ষণ, আর অন্যদিকে ভিন্ন বিষয়বস্তু এবং নতুন নতুন প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী কাব্য রচনার তাগিদ— এই নতুন আঙ্গিকের দ্বন্দ্বে তখনকার কবিদের মধ্যে জেগে উঠেছিল ভিন্ন ভিন্ন সুর। এই পটভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিলেন নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখেরা। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন-

> 'যাকে কল্লোল যুগ বলা হয়, তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।'[৯]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কল্লোল গোষ্ঠীর সম্পর্ক প্রথমত বিরোধিতার এবং পরবর্তীতে বন্দনার। সেই সময়ের বাংলা সাহিত্যের ধারক ও বাহক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ষোলআনা নেতৃত্ব ছিল তাঁর। কলোচ্ছ্বাসের সেই ধাপে দানা বাঁধছে আবেগ ও উদ্দীপনা। শরীরের মজ্জায় বয়ে চলেছে যৌবনের উন্মাদনা। আনন্দ নয়; দুঃখ, দারিদ্র্য, বেদনা, হতাশা সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে। একালের সাহিত্যের এটাই যুগলক্ষণ হিসাবে পরিগণিত হল। এই দাবি প্রথম ধ্বনিত হল 'কল্লোলে'র পাতায়। অর্থাৎ রবীন্দ্র জীবনভাবনা থেকে সরে আসবার চেষ্টা ছিল সেই সময়ের কবি, সাহিত্যিকদের। চেষ্টা ছিল স্বতন্ত্র হয়ে ওঠার। চেষ্টা ছিল নতুন পথ আবিষ্কারের। এর জন্য প্রয়োজন ছিল বলিষ্ঠ আকুতির। এই সময়ের তরুণ লেখকরা রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে, পেরিয়ে চলে যেতে চেয়েছেন অনেক দূরে।

'কল্লোল' কেন্দ্রিক কবিদের কাব্যকৃতি ছিল যুগচিহ্নিত। ছিল যুগকে, যুগের যন্ত্রণাকে রূপ দেয়ার আকুতি। এই আকুতিকে ধারণ করে আছে এই সময়ের সাহিত্য। সেই যুগের বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলার লক্ষ্য ছিল তাঁদের। অর্থাৎ রবীন্দ্রযুগকে অতিক্রম করার ইচ্ছে ছিল প্রবল। কিন্তু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করা অসম্ভব। রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন ব্যাপার। কিন্তু 'কল্লোলে' যখন তিনি যুক্ত হলেন, তখন থেকেই তিনি নতুন গতি তথা মোড় পেলেন। তাঁর কাব্যাদর্শের মূল কথা হয়ে গেল রবীন্দ্র বিরোধিতা। ওই বিরোধ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও তিনি নিজেকে আলাদা করে দেখানোর চেষ্টায় রত ছিলেন আর এই প্রসঙ্গ ধরেই ড. সুকুমার সেন তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'সমসাময়িকদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার মুখ্য কবি।'[১০]

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলো 'কল্লোল পত্রিকা'। কল্লোলের সেই বিদ্রোহ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে, রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে, প্রচলিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে, যে ভাবনা, যে সৌন্দর্য মানুষকে স্থিতাবস্থা দিয়েছে তার বিরুদ্ধে। একটা মোচড় দেবার চেষ্টায় তাঁরা সবসময় ভাবিত। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে এই বিরোধিতা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ হাজির করলো যে, রবীন্দ্র সাহিত্যে নেই আধুনিকতা। নেই বাস্তবতার চিহ্ন। একদিন যা ছিল রবীন্দ্রবিরোধিতা তা হল রবীন্দ্রবন্দনা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এই পথের পথিক। তাঁর প্রথম কবিজীবনে রবীন্দ্রভাবনাকে অতিক্রমণ করার উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে প্রকাশ পেয়েছিল রবীন্দ্রবরণে আগ্রহ— এই দ্বান্দ্বিকতা তাঁর কবিভাবনাকে স্বকীয়তা তথা নিজস্বতার পরিচয় দান করেছে। এক্ষেত্রে তাঁর 'নীল আকাশ' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা স্মরণে আসে সেখানে তিনি বলেছেন—

'ছোট ঘরে সন্ধ্যাবেলা তাই সব বসেছি বন্ধুরা
তোমার বিদায় দিতে...
আলোকিত হয় নাই প্রত্যহের জৈব সমস্যারা
চেতনায় একা তুমি, দলবদ্ধ নহ্ ঐকত্রিক' (রবীন্দ্রনাথ)

এই কবিতার বিষয় রবীন্দ্রনাথ নয়। এখানে তিনি দেখিয়েছেন ঐকত্রিকতার পথে চলতে চলতে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কত আন্তরিকভাবে একক হয়ে গিয়েছেন। নিজেকে আলাদা করে দেখানোর বিষয়টাই তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে। সেখানে অচিন্ত্যকুমার হেঁটেছেন একক মাত্রিকতার পথে। অপর দিক থেকে বলা যায়, আধুনিক কবিদের যে গোত্র; সেখান থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন। প্রমথ চৌধুরী এ বিষয়ে যা বলেছেন, তা অচিন্ত্যকুমার নিজে জানাচ্ছেন আমাদের এইভাবে-

> 'এমনভাবে লিখে যাবে তোমার সামনে আর কেউ দ্বিতীয় লেখক নেই। কেউ তোমার পথ বন্ধ করে বসে থাকেনি। লেখকের সংসারে তুমি একা, তুমি অভিনব। ... তোমার পথের তুমিই একমাত্র পথকার। সে তোমারই একলার পথ। যতই দল বাঁধো প্রত্যেকে তোমরা একা।'[১১]

অর্থাৎ আমি আছি— আমি পৃথক এক ব্যক্তি, আমার বক্তব্য আমারই, আমার কণ্ঠস্বর আমারই, আমার ভাবনা চেতনা আমারই— এই ধরনের পৃথক পৃথক বোধ নিয়েই প্রত্যেক কবিকে, শিল্পীকে এগিয়ে যেতে হয়। এ তাঁর রক্তের টান থেকে উঠে আসা সাহিত্য তাঁর ভিতরে অতীত ও সমসময়ের দ্বন্দ্ব চলতে থাকে প্রতিনিয়ত। অচিন্ত্যকুমার মর্মে মর্মে কবি। এই মর্ম চেতনার ইঙ্গিতে তিনি রোমান্টিক কবি। সেই সময়কালে রবীন্দ্রপ্রবর্তিত যে রোমান্টিকতা, বাংলা সাহিত্যে জোয়ার এনেছিল তাকে প্রতিরোধ জানালেন তিনি। নিজের গতিপথে তিনি নতুন রোমান্টিকতাকে আহ্বান জানালেন। তিনি যথেষ্ট পরিমাণে 'আধুনিক মনস্ক' নন— এ অভিযোগ বারবার তাঁর বিরুদ্ধে এসেছে। হ্যাঁ, এখানে তাঁর সীমাবদ্ধতা আছে। সেই সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে দেশকালের পটভূমিকায় বাংলা কাব্যের যে আঁকাবাঁকা পথ, সেখানে তিনি স্বতন্ত্রের কোন পরিচয় দিতে পারেননি, এমন অভিযোগ সত্য নয়। কিন্তু তিনি বিদ্রোহের কবি, তিনি বিরুদ্ধতার কবি, তিনি অভিনবত্বের কবি। একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন—

'মৃন্ময় দেহের পাত্রে পান করি তপ্ত তিক্ত প্রাণ
গাব আজ আনন্দের গান।
বিশ্বের অমৃত রস যে আনন্দে করিয়া মন্থন
লভিয়াছে নারী তার মুখোদ্বেল তপ্ত পূর্ণ স্তন...
যে আনন্দে আন্দোলিত সুগন্ধ নন্দিত স্নিগ্ধ চুম্বন তৃষ্ণায়
বঙ্কিম গ্রীবার ভঙ্গে, অপাঙ্গে, জঙ্ঘায়,
লীলায়িত কটি তটে ললাটে ও কটু ভ্রকুটিতে
চম্পা অঙ্গুলিতে
পুরুষ পীড়নতলে যে আনন্দ কম্প্র মুহ্যমান
গাবো সেই আনন্দের গান।' (গাব আজ আনন্দের গান)

অচিন্ত্যকুমারের এই অপকট উদ্দামতা সেই সময়ের রক্ষণশীল গোষ্ঠীর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এই স্তবকবন্ধ, এই শব্দ ব্যবহার, এই চিত্রকল্প নির্মাণ সত্যিই অভিনব। এই অনুশীলন রবীন্দ্রনাথ থেকে দূরবর্তী থাকার জন্য সম্ভব হয়েছে। এই নতুন পথের অভিযাত্রীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দূরদর্শী অভিমত দিয়েছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে-

> 'যেসব লেখক বে-আব্রু লেখা লিখেছে তাঁদের কারো কারো রচনাশক্তি আছে। যেখানে তাদের গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে সেটা স্বীকার করা ভালো। যেটা প্রশংসার যোগ্য তাকে প্রশংসা করলে তাতে নিন্দা করবার অনিন্দনীয় অধিকার পাওয়া যায়।'[১২]

রবীন্দ্রনাথ চিরকাল কল্লোলীয় লেখকদের বে-আব্রুতার রচনার যেমন নিন্দা করেছেন। আবার অচিন্ত্যকুমারের প্রতিভাকে স্বীকার করে তিনি একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন—

> 'তোমার কল্পনার প্রশস্ত ক্ষেত্র ও অজস্র বৈচিত্র্য দেখে আমি মনে মনে তোমার প্রশংসা করেছি।'[১৩]

কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এক নতুন জগত আবিষ্কারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাংলা কাব্যজগতে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। নেমে এলেন কল্পনালোক থেকেও। প্রবেশ করলেন জীবনাশ্রিত প্রকাশের বাস্তব ভূমিতে। আর সেখান থেকেই বাংলা কাব্যের জগতকে আবিষ্কার করলেন তিনি। বাস্তব প্রেক্ষাপটকে আঁকতে গিয়ে তাঁর প্রয়োজন হলো নানান আকাঁড়া শব্দের। এ বিষয়ে তাঁর অনেকদিনের সহযোগী সাহিত্যিক বন্ধু জানাচ্ছেন—

> 'নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টিতে অচিন্ত্যকুমার বরাবরই পারদর্শী। ব্যকরণশুদ্ধ সেই সকল শব্দচ্ছটা লক্ষ্য করে তাঁর সমকালীন বন্ধু লেখকরা প্রকাশ্যে তাকে তারিফ করতো এবং অপ্রকাশ্যে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হতো।.... আবার বলি শব্দের সুব্যবহারে সম্ভবত তিনি অদ্বিতীয়। বাংলা শব্দের তিনি সুদক্ষ ক্রিয়াবিদ।'[১৪]

তবে হালকা শব্দের চেয়ে গম্ভীর, তৎসম শব্দের দিকেই তাঁর রুচির গতির বদল ঘটেছে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। যেমন 'কে মোরে চিনিতে পারে' এই কবিতায় ব্যবহৃত 'কোথা মোর অখণ্ডমণ্ডন' এই পদত্রয়ী আবার 'প্রিয়া ও পৃথিবী' কবিতায় উল্লেখিত 'স্ফুরৎপ্রবাল ওষ্ঠে' শব্দটি উল্লেখযোগ্য। 'মাতৃস্তোত্র' কবিতায় ব্যবহৃত 'অবাক গোচর' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। শব্দ ব্যবহারে চমক তৈরি করতে চেয়েছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। এ বিষয়ে বলা যায়—

> 'শব্দের সূক্ষ্ম অনুভূতিগত আবেদনের চেয়ে শ্রুতিগত বৈচিত্র্যের দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশি দেখা যায়।'[১৫]

এই লেখার প্রায় আরো চল্লিশ বছর পেরিয়ে গেছে। তখন তিনি আরো পরিণত। এই পরিণত মন যা লিখেছে সেখানে সোজাসুজি শব্দের কথা উঠে এসেছে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিজীবনের পরিধি প্রায় পঞ্চাশ বছর। দীর্ঘ এই পাঁচ দশক ধরে অচিন্ত্যকুমারের কবি মানসিকতা তথা কাব্যচর্চা সবসময় একই সারণি ধরে অগ্রসর হয়েছে, তা নয়। সেই পর্বে তাঁর কবিসত্তায় এসেছে বৈচিত্র্য, ঘটেছে রূপান্তর। এই রূপান্তরের ইঙ্গিত বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

> 'আবার এও ঠিক কেন্দ্রীয় একটি চরিত্রও রচিত হয়েছে— যা থেকে অচিন্ত্যকুমারের কবিসত্তা আমরা ছেঁকে তুলতে পারি। সেই সত্তায় প্রেম ও দেশপ্রেম, বিদ্রোহ ও সমর্পণ, কর্ম ও মরমী বোধ বিমিশ্র। অচিন্ত্যকুমারের কবিসত্তায় অন্তঃসংকট আছে, একরৈখিক কবি নন তিনি। ত্রিশের বুদ্ধিবাদী দলের সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী ও বিষ্ণু দে'র তিনি কেউ নন। রবীন্দ্রনাথ—নজরুল—সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতোই তিনি হৃদয়ের পথের পথিক। তবে সে পথ একেবারে সরল ও সংঘর্ষবিহীন নয়।'[১৬]

তাঁর কবিতা হল তাঁরই সুরচিত সীলমোহর স্বাক্ষরিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি কবিকে কবির নিজস্ব গতিপথকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে— যা মৌলিকতার ইঙ্গিত বহন করে। দীর্ঘ 'আত্মআবিষ্কারের' মধ্য দিয়ে এই স্বকীয়তাকে স্থাপন করতে হয়েছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এ বিষয়ে ভিন্ন পথের পথিক। তাঁর শেষজীবনের কাব্যগুলোতে ফুটে উঠেছে চরম আধ্যাত্ম্যভাবনা তথা ঐশ্বরিক চেতনা। এ বিষয়ে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু বলছেন—

> 'অচিন্ত্যর মতো সংশয়বাদী ও সীনিক যে একজন পরমভক্ত হয়ে উঠবেন এটা কিন্তু আমি কোনদিন কল্পনা করিনি। একবার লক্ষ্য করি যে, তিনি প্ল্যানচেট নিয়ে মেতে উঠেছেন। বলতেন একটু এগিয়ে থাকতে। এগোতে এগোতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা লাভ করেন। লোকে বলতো ওটা একটা চাল। কিন্তু অচিন্ত্যকে দেখে শুনে ও তাঁর কথা শুনে আমার প্রত্যয় হয় যে, তিনি সত্যিই সাধনমর্গে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর স্বভাবই এই যে, তিনি যখন যেটা ধরবেন সেটা শক্ত মুঠোয় ধরবেন। তা সে সাহিত্যই হোক্, আর ধর্মই হোক।'[১৭]

এটাই বৈচিত্র্যসাধক অচিন্ত্যকুমারের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা একপ্রকার প্রবণতা। এই কথাগুলি তাঁর কবিকৃতির স্বকীয়তাকে বহন করছে। আমরা যাকে 'অশ্রান্ত এষণা' বলি— তারই অপর নাম 'অতন্দ্র সক্রিয়তা', তাকেই এককথায় বলা যায় শক্ত মুঠোয় ধরা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মনে এই উপলব্ধি এসেছিল সেই ছাত্রজীবনে বাংলার পন্ডিত মহাশয়ের কথায়। এইভাবেই বাংলার কবিদের মিছিলে তিনি এককভাবে নিজের পথ তৈরি করে নিয়েছিলেন।

অচিন্ত্যকুমারের রবীন্দ্র বিরোধিতা আবার পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ— এই ঘটনা সেই সময়ের অন্যান্য কবি অর্থাৎ যাঁরা 'রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ' বলে পরিচিত তাঁদের মতো নয়। রবীন্দ্র অনুসারী কবিরা বেছে নিয়েছিলেন আত্মনিবেদনের পথ। মৌলিকতা প্রকাশের পথ তাদের আয়ত্তে ছিল না। কিন্তু অচিন্ত্যকুমার বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছেন নিজস্ব প্রত্যয়ে, অগ্রসর হবার সংকল্প নিয়ে। অচিন্ত্যকুমারের এই লোকায়ত রোমান্টিক চেতনা প্রথমত দেহগত বৃত্তলগ্ন হয়ে শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক বা ঈশ্বর প্রীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, যা বিশ শতকের ত্রিশের ও চল্লিশের দশকের আর কোনো কবির মধ্যে এত ব্যাপক আকারে দেখা যায়নি। এই পরিবর্তন তাঁর জীবনবোধের রূপান্তরের কারণে হয়েছে বলা যায়। এখানেও তাঁর মৌলিকতা ধরা পড়ে।

অচিন্ত্যকুমারের কাব্যসাধনা যত এগিয়ে চলেছে, ততই তাঁর কাব্যের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে ঈশ্বরচেতনা। অচিন্ত্যকুমার এই পথের পথিক হওয়ার নেপথ্যে রবীন্দ্র প্রভাব ও প্রেরণা কাজ করেছে বলা যায়। তাঁর কাব্যের উত্তরপর্বে এই ঈশ্বরবিশ্বাস আকস্মিক নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও একটি বিশেষ সময়ে তথা পর্বে ঈশ্বরমুখীনতার আভাস দেখা গিয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা পরবর্তীতে তাঁর ওপর জয়লাভ করেছিল বলে তা জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরবর্তীতে তাই তিনি সহজ কবিতার ক্ষেত্রে নেমে এসেছিলেন। কিন্তু অচিন্ত্যকুমারের মধ্যে ঈশ্বরচেতনা স্থায়িত্ব লাভ করেছে— যা তাঁকে আধুনিক কবিদের ভিড়ে নিজের মতো করে স্বকীয়তার পরিচয় দান করেছে। এ বিষয়ে এক সমালোচক বলেছেন—

> 'তাঁর বাঙময়তার মধ্যে লক্ষ্য করা যেত ঐশ্বরিক গবেষণার একটি নতুন রস, নতুন ব্যাখ্যা, নতুন ব্যঞ্জনা। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছে তাঁর ভগবৎ দর্শনবাদ। কিন্তু তাঁর সমকালীন পাগলাদের মধ্যে কেউ সত্যই ঝুলে পড়ল কিনা সে খবর পাওয়া যায়নি। তিনি প্রথম ভক্তি ভাসমান হলেন।'[১৮]

যদি তাই হয় তবে তাঁর প্রথম জীবনের কবিত্ব সাধনার যুগ থেকেই এই ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে বলা যায়। সেখানে ঈশ্বরভাবনার বীজ যাকে বলে, তা পাওয়া যায়। এই বীজ পরের কাব্যগ্রন্থগুলিতে ক্রমশ অঙ্কুরোদগম হতে হতে বৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

'অমাবস্যা' কাব্যে গুরুত্ব পেয়েছিল জীবননিষিক্ত ভাবনা। 'প্রিয়া ও পৃথিবী' এবং 'মধ্যবর্তী কবিতা' পর্বে রোমান্টিক প্রেম, নারী ও জীবনকেন্দ্রিক ভাবনা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এই সময়পর্বে তিনি বললেন 'আয়ুর সমুদ্রে মোর দুই চক্ষে মৃত্যু লক্ষণীয়'। এই পথ পেরিয়ে ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে 'নীল আকাশ' কাব্যগ্রন্থে এসে তিনি শোনালেন 'স্তব্ধতা'র ব্যাখ্যা।

'আমি শুনতে পাই শুধু স্তব্ধতা
ঈশ্বরের প্রবল অট্টহাস্য দিয়ে যা তৈরি,

যা তৈরি আমার মৃত্যুর উপস্থিতি দিয়ে।'

কাব্য 'আজন্ম সুরভি'তে অচিন্ত্যকুমারের উপলব্ধির জগতে ঘটেছে পাঠান্তর। এই পর্বে কবি অনায়াসে লিখে চলেছেন ধর্মগুরুদের জীবনভাষ্য। আর বিভিন্ন তথ্য ভাবনাকে কাব্যরূপ দেবার অঙ্গীকার ভবানী মুখোপাধ্যায় অচিন্ত্যকুমারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

> 'একবার জীবনসের সাহিত্য আবার পরমুহূর্তে ভক্তিমার্গে বিচরণ, এই দুই বিপরীত পথে বিচরণে কোনরকম অসুবিধা হয় না? মনের দিক থেকে? ভাবের দিক থেকে?[১৯]

এর উত্তরে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত নিজে আমাদের যা জানাচ্ছেন তা এরকম,-

> 'ভক্তিসাহিত্য যে কী অপার সমুদ্র তা কি বলব। ঠাকুরের জীবনী লেখার পর লিখেছি 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ', 'পরমাপ্রকৃতি সারদামণি' দুই খন্ডে 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' তৃতীয় খণ্ড লিখেছি। ...। 'ভগবতী তনু' শেষ করেছি। তারপর 'করুণাঘন বুদ্ধদেব' অনেকখানি লেখা আছে। এরপর 'যীশুখ্রীষ্ট' নিয়ে লিখব। আমি তো বলেছি দিয়াশলাই জ্বেলে সূর্যকে দেখানো যায় না, কিন্তু গৃহকোণে পূজার প্রদীপটি হয়তো জ্বালানো যায়। আমার এই কাজ শুধু সেই দীপ জ্বালানো পূজা, দীপ জ্বালানো আরতি। আমার সাধ্য কি লিখি, আমাকে তিনি লিখিয়েছেন, আমি অনুভব করেছি সেই শক্তির প্রভাব। আবার এই জীবন থেকে জীবে নেমে এসেছি। দুই দিকের দুই প্রান্ত। নর আর নারায়ণে প্রভেদ কি? একদিকে মানুষের জয়গান অন্যদিকে দেবতার।[২০]

এই উপলব্ধি অনন্তকেন্দ্রিক। এই কাব্যে তিনি একটা ভিন্নধর্মী পথের হদিশ পেয়েছিলেন বলা যায়।

আমরা লক্ষ্য করেছি 'আজন্ম সুরভি' কাব্য থেকে যে ইশ্বরবিশ্বাস ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছিল, 'উত্তরায়ণ' কাব্যে এসে সেই অনুভূতি ও দিব্যজীবনের প্রতি আকুতি যেন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে। মানুষ ও ঈশ্বরের আত্মিকতা, ঐক্য ও দূরত্ব তিনি জেনেছেন। তারই শিল্পায়ন ঘটেছে তাঁর শেষের দিকের কাব্যগুলিতে।

> 'অচিন্ত্যকুমারের কবি জীবনের উপান্ত পর্বে মরমীবোধ এবং শরীরী বাসনার দ্বন্দ্ব হঠাৎ উদ্ধারিত হয়ে গেছে। মরমী বোধ অচিন্ত্যকুমার উত্তীর্ণ হয়েছিলেন একদিনে নয়— ক্রমশ কিন্তু অচিন্ত্যকুমারের ব্যক্তি স্বভাবের সততা ও দৃঢ়তা যেমন সব পর্যায়ে তেমনি অন্তপর্বেও ঈশ্বরবিশ্বাস কবির একালের কবিতার কেন্দ্রীয় সুর'[২১]

অতএব বলা যায় তিনি যত বেশি ঈশ্বরমুখী হয়েছেন তত বেশি তাঁর কবিতা তত্ত্বে, ভক্তিতে, আধ্যাত্মিক রসে নিষিক্ত হয়েছে।

আমরা জানি বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাষ্য। সেখানে পদাবলীর আবেদন যেমন সত্য, পাশাপাশি তত্ত্বের বিষয়টিও সমান সত্য। অচিন্ত্যকুমারের জীবনতত্ত্ব কাব্যের এই পরিণামে ধর্মগুরু তথা মনীষীদের জীবনী লেখার সংকটাপন্ন হলেও, তাঁর সততা তাঁকে অনেকটা রক্ষা করতে পেরেছে। শিল্পের নির্মোহ বিচার তাঁর পক্ষে সবসময় যায়নি। এর ফলে তাঁর মূল কাব্যদর্শন বেশিরভাগ স্থলে হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত। এই জটিল, কঠিন পথে অচিন্ত্যকুমার একক নির্জন পথিক রূপে চিহ্নিত হয়েছেন। এটি যেমন তাঁর কৃতিত্ব, তেমনি যুগসঙ্কটের বৃত্ত থেকে মুক্তির জন্য তিনি কবিতায় ভক্তিমুখী বক্তব্য উপস্থাপন করার কঠিন ব্রত নিয়েছিলেন। সেই সংকল্প তাঁকে অনিবার্যভাবে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখক থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল এবং তিনি হয়েছিলেন নিঃসঙ্গ পথের পথিক। এ যেন সমগ্রতার বৃত্ত থেকে অখন্ড একাকী চালচিত্রের পিছনে ছুটে চলা।

তথ্যসূত্র:

১. মিত্র, হরপ্রসাদ (সম্পাদনা), 'কবি অচিন্ত্যকুমার', 'অচিন্ত্যকুমারের সমগ্র কবিতা', পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫৯০
২. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, 'কল্লোল যুগ', পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৭১
৩. উজাগর পত্রিকা, 'অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সংখ্যা', অষ্টাদশ বর্ষ ১৪২৯, কল-১২, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৯
৪. 'অচিন্ত্যকুমার সেনুগুপ্তের শতবার্ষিকী সংকলন', 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ', মিত্র ও ঘোষ, কোল-৭৩, মুদ্রণ-১৪২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৪৯
৫. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৪৯
৬. 'তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৫০
৭. অচিন্ত্যকুমারকে লিখিত পত্র, 'কথাসাহিত্য পত্রিকা: অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত জন্মশতবর্ষ সংখ্যা', কোল-০৯, মুদ্রণ- ১৪১০ মাঘ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২
৮. সেনগুপ্ত, কিরণশঙ্কর, 'ত্রিশের কবিতা', 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস' দে'জ, মুদ্রণ-ডিসেম্বর ২০১৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯৭
৯. 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক', বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সমগ্র, দে'জ, মুদ্রণ-১৩৬৬ বৈশাখ, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৮২
১০. সেন, সুকুমার, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (পঞ্চম খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কল-৭৩, মুদ্রণ- জুন ২০০৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩১৬
১১. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, 'কল্লোল যুগ', পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৮৮
১২. সূত্র দক্ষিণারঞ্জন বসু 'একদা কবি নীহারিকা দেবী এবং তারপর', কথাসাহিত্য পত্রিকা: শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সম্বর্ধনা সংখ্যা, ১৩৭৫ শ্রাবণ, কোল- ০৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১২৫৮
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১৫২০।
১৪. সান্যাল, প্রবোধকুমার, 'অনন্য অচিন্ত্যকুমার', কথাসাহিত্য পত্রিকা, 'অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সম্বর্ধনা সংখ্যা', কোল- ০৯, মুদ্রণ- ১৩৭৫ শ্রাবণ, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১৪৫৪, ৫৫
১৫. মিত্র, হরপ্রসাদ (সম্পাদনা), 'কবি অচিন্ত্যকুমার', পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫৭৯
১৬. মাস্তাম, আব্দুল সৈয়দ, 'অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতা', 'দৈনিক সংবাদ সাময়িকী', কোল- ০৭, ২৪ শে নভেম্বর ১৯৯৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৯
১৭. রায়, অন্নদাশঙ্কর, 'বন্ধু অচিন্ত্যকুমার', কথাসাহিত্য পত্রিকা: অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সম্বর্ধনা সংখ্যা, ১৩৭৫ পৌষ, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১৪২৯
১৮. সান্যাল, প্রবোধকুমার, 'অনন্য অচিন্ত্যকুমার', 'কথাসাহিত্য পত্রিকা', পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১৪৫৬
১৯. মুখোপাধ্যায়, ভবানী, 'বিচিত্র অচিন্ত্যকুমার', 'কথাসাহিত্য: অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা', ১৪১০ মাঘ, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৫৩
২০. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৫৩
২১. মান্নান, সৈয়দ আব্দুল, 'অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতা', দৈনিক সংবাদ সাময়িকী, নভেম্বর ১৯৯৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৮